**ভাসমান পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ও শাকসবজি চাষ**

তিনভাগ জল আর ১ ভাগ স্থলভিত্তিক বাংলার সিংহভাগ বাস্তবতা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল। বৃহত্তর বরিশালের কথাই বলি। এখানে পানি আর পানি অথৈই পানি। বছরের ৬ থেকে ৭ মাস পানি বন্দি থাকে সিংহভাগ এলাকা। নিজেদের বাঁচার তাগিদে তারা উদ্ভাবন করেছে একটি বিশেষ প্রযুক্তিগত পদ্ধতি। ভাসমান এ পদ্ধতিকে তারা স্থানীয় ভাষায় বলে ধাপ পদ্ধতি বা বেড় পদ্ধতি। পানিতে ভাসমান বলে ভাসমান পদ্ধতি। আর কচুরিপানা টেপাপানা দিয়ে ধাপে ধাপে এ কাজটি সাজানো হয় বলে ধাপ পদ্ধতিও। দূর থেকে মনে হয় সবুজের জৈব গালিচা। দেখলে তখন মনে হয় অনিন্দ্য সবুজ সুন্দর ভুবন। সেখানে পুরুষ মহিলাদের সম্মিলিত বিনিয়োগে সৃষ্টি হচ্ছে দেশের এক প্রতিশ্রুত ইতিহাস আর সমৃদ্ধির হাতছানি। জোয়ারের পানিতে ভাসছে, আর ভাটায় জেগে উঠা উজানি চরে ভিন্নভাবে জেগে উঠেছে এসব। কৃষক দিনের পর দিন দেখে, শুনে, বুঝে প্রয়োজনে ভাসমান বা কচুরিপানার ধাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মাটি ছাড়া পানিতে চাষাবাদের বিজ্ঞানীদের দেয়া কেতাবি নাম হাইড্রোপনিক পদ্ধতি। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া, আগৈলঝাড়া উজিরপুর, পিরোজপুরের নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি উপজেলার বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে সবজি চাষ করছেন অগণিত কৃষকরা। বর্ষায় এসব এলাকার হাজার হাজার হেক্টর নিচু জমি জলে বন্দি থাকে। জলাবদ্ধতা আর কচুরিপানা অভিশাপ কৌশলের কারণে পরিণত হলো আশীর্বাদে। ধারণা করা হয় পদ্ধতিটি প্রথম বের করেন নাজিরপুরের কৃষকরা। সেখানেই শুরু হয় ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ।

এমনিতে সারা বছর নিচু জমিতে জোয়ার ভাটার কারণে জমি পানিতে জলাবদ্ধ থাকে। ভাসমান কচুরিপানা পানিতে ভেসে থাকত প্রায় বছরব্যাপী। সাধারণভাবে কচুরিপানা বহুমাত্রিক অসুবিধার কারণ। এ জঞ্জাল কচুরিপানাকে তারা ধাপে ধাপে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। তারপর সেসব ধাপের উপর টেপাপানা দিয়ে তৈরি করে ভাসমান বীজতলা। এভাবে ভাসমান ধাপের উপরে বিভিন্ন রকম সবজির দৌলা দিয়ে মনের মাধুরি দিয়ে সাজায় নান্দনিক ভাসমান বীজতলা। সেসব ভাসমান বীজতলায় কোনোটায় পেঁপে, লাউ, কুমড়া, শিম, বরবটি আবার অন্যগুলো টমেটো, বেগুন, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি, শসার চারা উৎপাদন এবং লাউশাক, লালশাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক বা সাদা শাকের চাষও করেন। এসব ভাসমান বীজতলাগুলো যাতে ভেসে না যায়, সেজন্য তারা শক্ত বাঁশের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। শুকনো মৌসুমে পানি সরে গেলে সেসব কচুরিপানার ধাপ জমিতে মিশে জৈব পদার্থের অতিরিক্ত জোগান দেয়। জমি হয় উর্বর। শুকনো মৌসুমে এখানকার মানুষরা চাষ করে বোরো ফসল। এত দিন তারা ভাসমান বীজতলায় কোনো রাসায়নিক সার ব্যবহার করত না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের পরামর্শে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করে ভালো ফল পাচ্ছেন। আগে যেখানে সবজির চারাগুলো ছিল কিছুটা লিকলিকে দুর্বল এখন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনে আর মানসম্মত বীজ ব্যবহারে শক্ত সবল স্বাস্থ্যবান চারার ফলনে সুফল পাচ্ছেন।

কেউ জানে না কখন থেকে শুরু এর পথচলা। ১৫০ বছরের ইতিহাস। একদিনে আসেনি। ইতিহাস ঘেঁটে যতদূর সম্ভব জানা গেছে বাবা দাদা চৌদ্দ পুরুষের ঐতিহ্যকে ধারণ করে লালন করে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে ভাসমান চাষ পদ্ধতি আজকের একবিংশ শতাব্দীর এ প্রান্তে এসেও প্রাণবন্ত যৌক্তিক আবশ্যকীয় এবং অবশ্যই সমসাময়িক পরিবর্তিত জলবায়ুর অভিযোজন কৌশলে পরিবেশবান্ধব। সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রযুক্তিতে বিল অঞ্চলের পতিত জমির পানিতে ভাসমান পদ্ধতিতে বিভিন্ন শাকসবজির চারা উৎপাদন ও চাষাবাদে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে এ এলাকার কৃষকরা। এ পদ্ধতির সুফল ছড়িয়ে পড়ছে আকৃষ্ট করেছে পার্শ্ববর্তী উপজেলা ও জেলাগুলোর কৃষকদেরও। এসব গ্রামগুলোতে বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত থৈ থৈ করে পানিতে। ফলে এ সময় কৃষিকাজ না থাকায় আগে অলস সময় কাটাত। এ এলাকার মানুষরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে নাজিরপুর উজিরপুর বানারীপাড়া স্বরূপকাঠির হাজারো পরিবারের সহস্র্রাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন ভাসমান ধাপের ওপর সবজি চারা ও সবজি মশলা উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে।

কৃষকরা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও স্বাবলম্বী করছেন। সবজির চারা পরিবহন ও  কেনা-বেচার মাধ্যমে জীবন-জীবিকার নতুন প্রতিশ্রুত অধ্যায় রচিত হয়েছে কয়েক লাখ মানুষের। আগের অনাবাদি জমি বর্তমানে খুবই মূল্যবান হয়ে উঠেছে সে এলাকার লোকদের কাছে। জলসীমায় কৃষির এ বিশেষ চাষ পদ্ধতির কারণে সারাদেশে বরিশালের বিশেষ অঞ্চলগুলো পায়োনিয়ার হয়ে আছে সারাদেশে। সবশেষ এ চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন জেলার নাজিরপুর উপজেলা ও নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলার কৃষকরা। আস্তে আস্তে এ চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়ে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, যশোর,  নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুরসহ পানিযুক্ত বিল এলাকায়। বিল এলাকা হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় এসব জমি পানিতে তলিয়ে থাকে। ফলে সেসব জমিতে কোনো ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না। জমিগুলো কচুরিপানা, টেপাপানা, ক্ষুদেপানা,  দুলালীলতা, কলমিলতা, শেওলা ও ফ্যানা ঘাসসহ বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদে ভরা থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কৃষকরা সম্মিলিত যৌক্তিক উদ্যোগের ব্যবস্থা নেন তারা। জমির পানিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়া উদ্ভিদকে স্তূপ করে বিশেষ এ পদ্ধতিতে পানির উপরেই কৃষকরা ধাপের উপর প্রায় সব ধরনের শাকসবজির চারা ও শাকসবজি উৎপাদন করেন। নির্দিষ্ট কয়েক উপজেলার উৎপাদিত চারাই দক্ষিণাঞ্চলের চারার চাহিদা পূরণ করে অন্য অঞ্চলেও যায়। বর্তমানে সেসব বিল অঞ্চলে শত শত হেক্টর জলাবদ্ধ জমিতে অন্তত ২৫ হাজার কৃষক ও চারা ব্যবসায়ী চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। আগে চারা বিক্রি করে খুব একটা লাভবান না হলেও বর্তমানে চারার দাম ভালো থাকায় কৃষকরা খুশি।  

**সময়কাল**  
এ অঞ্চলের ধানি জমিতে বাংলা বছরের অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত বোরো ধানের চাষ হয়। এরপর জ্যৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ মাস ৭ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ ফুট পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে এসব জমি। তাই এ সময় এখানকার মানুষ বেকার হয়ে পড়েন। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি।  আষাঢ় মাসে কচুরিপানা সংগ্রহ করে স্তূপ করা হয়। জলাভূমিতে প্রথমে কচুরিপানা এবং পর্যায়ক্রমে শ্যাওলা, দুলালীলতা, টোপাপানা, কুটিপানা, কলমিলতা, জলজ লতা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ২ থেকে ৩ ফুট পুরু করে ধাপ বা ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয়। ধাপ দ্রুত পচানোর জন্যও সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়। এ ধাপ চাষের উপযোগী করতে ৭ থেকে ১০ দিন প্রক্রিয়াধীন সময় রাখতে হয়। দক্ষতা আর কার্যক্ষমতা আর কারশিমার কারণে এলাকার চাষিরা এখন বর্ষা পেরিয়ে সুদিনে খালে ভাসমান শাকসবজির আবাদ করেন। সারা বছরের প্রাসঙ্গিক জোগান নিশ্চিত রাখেন।

**বেডের আকার**

একেকটি ভাসমান ধাপ বেড কান্দি ৫০ থেকে ৬০ মিটার (১৫০ থেকে ১৮০ ফুট) লম্বা ও দেড় মিটার (৫ থেকে ৬ ফুট) প্রশস্ত এবং ১ মিটারের কাছাকাছি (২ থেকে ৩ ফুট) পুরু বা উঁচু বীজতলা ধাপ তৈরি করে তার উপর কচুরিপানা এবং পর্যায়ক্রমে শ্যাওলা, দুলালীলতা, টেপাপানা, কুটিপানা, কলমিলতা, জলজলতা স্তরে স্তরে সাজিয়ে নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া ও ক্ষুদ্রাকৃতির বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ পচিয়ে বীজতলার উপর ছড়িয়ে দেয়। সেখানেই বীজ বপন করে উৎপাদন করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির শাক আর দৌলা বা মেদা সাজানো চারা, এমনকি অল্প জীবনকাল সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। সারি সারি এসব বেড বা ধাপ জলজ বিলে অপরূপ রূপের মাধুরি ছড়িয়ে যেন নতুন এক সবুজের কারুকার্য খচিত মানচিত্র তৈরি করে।

**দৌলা বা মেদা**

ভাসমান বা ধাপ পদ্ধতিতে সরাসরি বীজ বপন সম্ভব না হওয়ায় কৃষকরা প্রতিটি বীজের জন্য এক ধরনের আধার তৈরি করেন। তারা এর নাম দিয়েছেন দৌলা বা মেদা। একমুঠো আধা পচা টেপাপানা বা ছোট কচুরিপানা, দুলালীলতা দিয়ে পেচিয়ে বলের মতো করে তার মধ্যে মধ্যে নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া দিয়ে তৈরি করা হয় দৌলা। সাধারণত নারীরা দৌলা তৈরির কাজ করেন। এ দৌলার মধ্যে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গর্ত করে বিভিন্ন সবজির অঙ্কুরিত বীজ পুঁতে মাচানে বা রাস্তার পাশে শুকনো জায়গায় রাখা হয়। এর আগে ভেজা জায়গায় বীজ অঙ্কুরিত করে নেয়া হয়। দৌলাগুলো এভাবে ৩ থেকে ৭ দিন লাইন করে রাখা হয়। ৭ থেকে ১০ দিন পর গজানো চারাগুলো ভালোভাবে বেরিয়ে আসলে ধাপে স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ধাপে স্থানান্তর করেন।

**ধাপ কৌশল ও যত্ন**

ধাপ তৈরির পর ধাপে জৈব উপকরণ দ্রুত পচাতে ব্যবহার করা হয় সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া সার। এ ধাপ চাষের উপযোগী করতে সাত থেকে ১০ দিন প্রক্রিয়াধীন রাখতে হয়। একটি ধাপের মেয়াদকাল কম বেশি সাধারণত ৩ মাস। ধাপে অঙ্কুরিত চারা পরিপক্ব চারায় পরিণত হয় মাত্র ২০ থেকে ২২ দিনে। যে কারণে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য ধাপগুলোর সামান্য পরিবর্তন করতে হয়। এরপর ৫ থেকে ৬ দিন পরপর ভাসমান ধাপের নিচ থেকে টেনে এনে নরম কচুরিপানার মূল বা শ্যাওলা টেনে এনে দৌলার গোড়ায় বিছিয়ে দেয়া হয়। এতে দৌলাগুলো একে অপরের সাথে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, আর জীবনের সঞ্জিবনী শক্তি পায় এখান থেকে। এ যেন পরম মমতায় উদ্ভিদের যান্ত্রিক শক্তি প্রদানের ব্যবস্থা। এরপর শুধু চারাগুলোর বেড়ে উঠার গল্প। কিন্তু এযে তরতর করে চারাগুলোর বেড়ে উঠা, এজন্য করতে হয় নিয়মিত পরিচর্যা আর যত্নআত্তি। এর মধ্যে পড়ে প্রতিদিন ধাপে হালকা করে পানি সেচ দেয়া। যাতে করে চারার গোড়া শুকিয়ে না যায়, সজীব থাকে। আর অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটানো। এভাবে মাসাধিক কাল যত্ন শেষে বিক্রির জন্য তৈরি হয়। বীজতলার মালিকরা অপেক্ষা করেণ মহাজন ফড়িয়ার জন্য।

এভাবেই বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। একটি অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় রোপণ করার ২০ থেকে ২২ দিনের মাথায় পূর্ণবয়স্ক চারায় রূপান্তরিত হয়। ১ সপ্তাহের মধ্যে কৃষক বা চারার পাইকারি ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যান এসব চারা। জৈবসারে উৎপাদিত এসব চারার উৎপাদন খরচ পড়ে ১ থেকে দেড় টাকা। ১ হাজার চারা আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। শাকসবজি বড় হলে চাষিরা ধাপ থেকে তুলে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করেন। পুরনো ধাপ কিনে কৃষকরা এর স্বল্প জীবনকালীন বিভিন্ন শাকসবজির আবাদ করেন। তাছাড়া পানি কমে গেলে এসব ধাপ মাটির সাথে মিশে জৈবসার হিসেবে কাজে লাগে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়।

**যেভাবে চাষ হয়**

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে সবজি উৎপাদনের এটি একটি বিশেষ কৌশল। পানিতে ভাসমান এ পদ্ধতিতে সারা বছরই সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এতে রোগবালাই কম হয়। এমনকি বালাইনাশক তেমন ব্যবহার করতে হয় না। পানির উপর ভাসমান সবজি চাষ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে নিয়েছে ধাপ অঞ্চলের মানুষ। এক সময় দেউলিয়া অঞ্চল হিসাবে খ্যাত এলাকার অভাবি মানুষগুলো এখন বেশ সুখেই আছে। হাইলা কামলার পরিচয় মুছে গেছে উপজেলার হাজার লাখো মানুষের। তারা সবাই এখন একেকজন গর্বিত কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি। অদম্য সাহস ও কঠোর পরিশ্রম নিয়ে কৃষিকাজে নেমে পড়েছে ভাটি অঞ্চলের মানুষগুলো। সবাই না হলেও দু-এক পরিবার বাদে অধিকাংশ পরিবার আজ তাদের পেশাগত পরিচয় পেয়েছে বিষমুক্ত সবজি চাষি হিসেবে। নিমজ্জিত জমির পানির ওপর ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা এবং কান্দিবেড় পদ্ধতির চাষাবাদ উদ্ভাবন করে এসব জমিতে ২৩ থেকে ২৫ ধরনের শাকসবজির, মসলা এবং চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানে বছরে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপন্ন হচ্ছে। এখানকার বিশালাকারের কুমড়া, বড় ও সতেজ বাঁধাকপি, ফুলকপি, মরমা, শিম, মুলা, বেগুন, টমেটো, শালগম, আলু, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, করলাসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি দিয়ে থরে থরে সাজানো নৌকাগুলো যখন সকালের সোনালি রোদে লাইন ধরে স্থানীয় বাজারগুলোতে যায় এবং বাজারে গিয়া নৌকায় নৌকায় বাজার বসায় সে অপরূপ দৃশ্য যে কোনো পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

**চাষ এলাকা**

নাজিরপুর, বানারীপাড়া উপজেলার দেউলবাড়ী দোবড়া ও মালিখালী, পদ্মডুবি, বিলডুমুড়িয়া, বেলুয়া, মনোহরপুর, মুগারঝোর, গাঁওখালী, বৈটাকাঠা, সাচিয়া, চিথলিয়া, কলারদোয়ানিয়া, যুগিয়া, গাওখালী, সোনাপুর, মেদা, পুকুরিয়া, পেনাখালী, মিঠারকুল, পদ্মডুবি, বিলডুমুরিয়া, গজারিয়া চামী ও গগন, প্রভৃতি এলাকায় ভূপ্রকৃতিগতভাবে অঞ্চলভেদে পানিবন্দি জলাবদ্ধ মানুষগুলো জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান ধাপের উপর শাকসবজির চারা উৎপাদন হয়। নাজিরপুরের পাশাপাশি নেছারাবাদ উপজেলার বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার বিশারকান্দি, মরিচবুনিয়া, উমারেরপাড়, কদমবাড়ী, মলুহারসহ বিভিন্ন গ্রামের জলাভূমিতে ব্যাপকহারে ধাপ চাষ হচ্ছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া বর্নীর বিল, চান্দার বিল ও কোটালীপাড়ার বাইগ্যারবিলে এ পদ্ধতির চাষ হচ্ছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ আর চাঁদপুর নেত্রকোনার বিস্তৃত অঞ্চল তো রয়েছেই।

ভাসমান পদ্ধতির এ চাষে নারী-পুরুষ-শিশু সবাই কাজ করে থাকে। পুরুষরা ধাপ তৈরি, চারা স্থাপন, পরিচর্যা ও উৎপাদিত চারা বিক্রির কাজ করেন। আর নারী ও শিশুরা বাড়িতে বসে চারা তৈরির প্রাথমিক স্তর বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটানো, দৌলা তৈরির কাজ করেন। তারা ঘরে বসে শ্যাওলা, নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করেন। স্থানীয় ভাষায় একে টেমা বা মেদা বা দৌলা বলা হয়। এর মধ্যে বীজ রেখে অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয় যা ভাসমান ধাপের উপর স্থাপন করে পরিচর্যার পর নির্দিষ্ট সময় পরে চারায় পরিণত হয়। এছাড়া সে ধাপের উপর সরাসরি কিছু সবজির অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। ধাপ চাষিরা লাউ, শিম, বেগুন, বরবটি, করলা, পেঁপে, টমেটো, শশা, পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, মরিচ, ও মশলার চারা তৈরি করেন। কেউ কেউ সে ধাপে হলুদ, মরিচ, আদা, লালশাক ও ঢেঁড়স আবাদ করেন। পাইকারি ক্রেতারা নদী পথে এসে ধাপ থেকে সরাসরি চারা কিনে সবজি আবাদকারীদের কাছে তা বিক্রি করেন।

**আয় ব্যয়**

সাধারণভাবে ৫০ থেকে ৬০ মিটারের একটি সারি, দল বা ধাপ তৈরি করতে খরচ হয় ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। এ ধরনের একটি ধাপ তৈরির জন্য একজন মানুষের ২৫০ টাকা মজুরি হিসেবে ৬ দিন ৮ থেকে বা ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। ধাপের জন্য ১ হাজার টাকার কচুরিপানা, ১ হাজার টাকার দুলালীলতা, ১ হাজার টাকার টেপাপানার দরকার হয়। ধাপে একজন কৃষক একটি বেড থেকে প্রথম ২০ থেকে ২২ দিনের মধ্যে আয় করেন ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। ধাপে ৬ ইঞ্চি দূরত্ব করে ১টি চারা স্থাপন করলে ১টি সারিতে মোট ২ হাজার ৪৫০টি চারা রোপণ করা যায়। প্রতি চারা পাইকারি ৩ টাকা বিক্রি করা হয়। পুনরায় ধাপ প্রস্তুত না করে প্রথমবার ব্যবহৃত ধাপ আবার অন্য কৃষকের কাছে বিক্রিও করে দেয়া যায় বা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায়। প্রথমবার ব্যবহৃত ধাপ বিক্রি হয় ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকায়। অনেকে ধাপ পদ্ধতি হতে বছরে একর প্রতি ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা লাভ করেন। ১০০ ফুট লম্বা একটি ধাপ তৈরি এবং চারা উৎপাদনে ৫ মাসে ব্যয় হয় ১৫ হাজার টাকা। ধাপ থেকে চারা বিক্রি করা হয় ২৫ হাজার টাকা।

এসব উপজেলার প্রায় ২৫ হাজার নারী শ্রমিক এ চারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। একজন ধাপ শ্রমিক প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০ টাকা আয় করেন। প্রতিদিন মহিলারা গড়ে ১ হাজার থেকে ২ হাজার দৌলা তৈরি করতে পারেন। এ কাজে একজন নারী শ্রমিক প্রতিদিন গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পান। ঝড় ও জলোচ্ছ্ব্াস এ পদ্ধতির চাষাবাদে তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। একধাপে এক মৌসুমে চারা উৎপাদন ও বিক্রি করে একরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাভ থাকে।

**প্রযুক্তিকে ফলপ্রসূ করতে হলে**

ভাসমান প্রদ্ধতি প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব কৃষির জন্য আর্শীবাদ। এ কৌশলকে আরও ফলপ্রসূ প্রাণবন্ত করতে হলে আমাদের সম্মিলিতভাবে করতে হবে ০১. মানসম্মত বীজ ব্যবহার  ও চাহিদাভিত্তিক বীজের দোকান, বীজ ব্যবসা; ০২. বীজ, সার, বালাইনাশক  উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করে স্থানীয় উপকরণ বাণিজ্য; ০৩. এলাকাভেদে বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; ০৪. চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুঁজি ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ; ০৫. উৎপাদিত চারা এবং সবজির সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ; ০৬. ভাসমান উৎপাদনের উপকরণসহ অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা চালু; ০৭. মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়িয়া দালালের দৌরাত্ম্য যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও কমানো; ০৮. সুধীজনের কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা; ০৯. এসব এলাকায় প্রয়োজনীয় হিমাগার স্থাপন ও ব্যবস্থা; ১০. কচুরিপানা চাষাবাদ করার কৌশল উদ্ভাবন; ১১. সরকারি বেসরকারি কোনো প্রয়োজনীয় সহায়তা বা পরামর্শ পাওয়ার উপযুক্ত উৎস ও কেন্দ্র; ১২. শুষ্ক মৌসুমে জলাশয়ের পরিবর্তে খালে বা পতিত জলসীমায় এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ কনটিনিউ করা; ১৩. সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরা; ১৪. সংশ্লিষ্ট সবার যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বাড়ানোর পদক্ষেপ। এ কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারলে ভাসমান শাকসবজি চাষ আমাদের  অনেক দূরের আলোকিত বাতিঘরে নিযে যাবে।

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি না হলে এবং কোন বিপর্যয় না ঘটলে মৌসুমে ৪ থেকে ৫ বার চারা উৎপাদন করে বিক্রি করা সম্ভব। নিজস্ব উদ্ভাবনী ভাসমান ধাপ পদ্ধতির চাষে ভাটি অঞ্চলের চাষিরা ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি জমি পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের কৃষি খাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তা ভাসমান চাষ পদ্ধতি দিয়েই অনায়াসে মোকাবিলা করা সম্ভব। দেশের ৪৫ লাখ হেক্টর জল সীমার মধ্যে অর্ধেক বা তার অর্ধেক কিংবা তারও অর্ধেক বিল জলসীমাতেও যদি ভাসমান সবজির আবাদ করা যায় তাহলে আমরা ভাবতে পার কত অভাবনীয় উন্নয়ন আর বিস্তৃতি আমাদের ছায়ার মতো আগলে রাখবে কৃষি সমৃদ্ধিতে? যদি বানারপাড়া নাজিরপুরের ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৌশল দেশের অন্য স্থানে গুরুত্ব দিয়ে পদ্ধতির চাষাবাদের বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ফল আসতে বেশি সময় লাগবে না। আর সমন্বিত প্রচেষ্টায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষক অধিকতর সফলতা পেলে ভাসমান চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জীবনের আর্থসামাজিক পরিবর্তনে আসবে আশা জাগানিয়ার বাস্তব গল্প। যাতে জড়িয়ে আছে প্রযুক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক চলমান বাস্তবতার সাথে সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার অন্যরকম স্বাদ, তৃপ্তি ও অবলম্বন। প্রাকৃতিক সমস্যা দূর করে এখানকার মানুষ প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠা করেছে অনিন্দ্য সুন্দর সবুজ খয়েরি মাটি রঙের কাব্যগাঁথা। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামরত মানুষের এভাবে বেঁচে থাকার উদাহরণ হতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকার কৃষির ভাসমান কাব্যগাঁথার বাস্তবতা। পানি বন্দি বা ২ লাখ হেক্টর জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের। বাঁচতে শেখার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারে এ জ্বলন্ত প্রমাণ। জরিপ ও অভিজ্ঞতা বলে এরকম আরও হাজার লাখ হেক্টর জমিকে খুব সহজেই ভাসমান চাষের আওতায় আনা সম্ভব। শুধু কি তাই বিশাল বাংলার যেখানে অবারিত জলরাশির সীমানা ৩ থেকে ৪ মাস খালি পড়ে থাকে সেখানে পরিবেশবান্ধব ভাসমান সবজির বীজতলা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় অনায়াসে। তখন অতিরিক্ত সমৃদ্ধির গতিতে এগোবে বাংলার কৃষি এবং অবশ্যই বাংলাদেশ। প্রতিকূল পরিবেশে এদেশের কৃষকদের ব্যতিক্রমী ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগই আমাদের ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। আর এ আলোর পথের সহযাত্রী হতে পারলে আমরাও হব আলোকিত মানুষ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

তথ্যসূত্র:http://www.ais.gov.bd

